সংবাদ সম্মেলন
কপ৩১ এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের জলবায়ু ন্যায়বিচার
তারিখঃ ৩ নভেম্বর, ২০২৬

আজকের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুতি এখন দীর্ঘস্থায়ী বাস্তবতা। আইওএম ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ মূল্যায়ন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের প্রায় ৬৩ শতাংশ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ২০২০ সালের এপ্রিলের আগেই। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুতি আর সাময়িক কোনো জরুরি পরিস্থিতি নয়; এটি বছরের পর বছর ধরে চলা একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের 'এশিয়া-প্যাসিফিক ক্লাইমেট রিপোর্ট ২০২৬' সতর্ক করেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানির সংকট ও কৃষি উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসীতে পরিণত হতে পারেন।

আন্তর্জাতিক গবেষণা ও নীতি আলোচনায় এখন দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, বৈশ্বিক তাপমাত্রা যত বাড়বে, তত বেশি এলাকা অভিযোজনের সীমায় পৌঁছাবে, আর দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতির শিকার মানুষের সংখ্যা বাড়বে। দ্বিতীয়ত, এই সংকটের সাড়াপ্রদান এখনো মূলত মানবিক সহায়তানির্ভর। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তুচ্যুত মানুষের জায়গা খুবই সীমিত। ফলে যাঁরা বছরের পর বছর শহরের অনানুষ্ঠানিক বসতিতে আছেন, তাঁদের সামনে টেকসই সমাধানের বাস্তব পথ প্রায় নেই।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক- খানি, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান ২০২৬ এর আগস্ট মাসজুড়ে সাতক্ষীরা পৌরসভার ৩৫টি অনানুষ্ঠানিক বসতির ৩৫৮টি পরিবারের ১,৩৪১ জন সদস্যের সাথে কথা বলে তাদের জীবন-জীবিকা-খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে। পৌরসভার ৪৭টি বসতিতে আনুমানিক ৭,৫৭৩টি জলবায়ু-বাস্তুচ্যুত পরিবার বাস করে, যদিও এই তথ্যটিও জুন ২০২৪ এর। স্থানীয় প্রশাসন বলছে এই সংখ্যা এখন আরও বেশি। আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল: চলমান জলবায়ু সংকট, কর্মহীনতা, মূল্যস্ফীতিসহ নানাবিধ সংকটের দিনগুলোতে দুর্যোগে ঘর, জমি ও জীবিকা হারানোর পর এই মানুষগুলো কেমন আছেন!

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা সূচক (FIES) অনুযায়ী, জরিপকৃত পরিবারগুলোর ৭৪.৯ শতাংশ পরিবার তীব্র এবং ২৩.২ শতাংশ পরিবার মাঝারি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে; খাদ্য নিরাপদ বলা যায় এমন একটি পরিবারও পাওয়া যায়নি। ৯০.৮ শতাংশ পরিবারের ঘরে কোনো খাবার মজুত নেই।

এই সংকট খাদ্যের প্রাপ্যতার নয়, প্রবেশাধিকারের। খাবার না পাওয়ার কারণ হিসেবে ৯৯.৪ শতাংশ পরিবার টাকার অভাব এবং ৭৮.৫ শতাংশ পরিবার উচ্চ দামের কথা বলেছে। খাবার জোগাড় করতে ৫৭.৩ শতাংশ পরিবার উৎপাদনশীল সম্পদ বা প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি জিনিস বিক্রি করেছে, আর ৯৫.২ শতাংশ পরিবারে বড়রা কম খেয়েছেন, যাতে শিশুরা খেতে পারে। খাদ্যের বৈচিত্র্যও দুর্বল: মাছ, মাংস বা ডিম সপ্তাহে গড়ে ১.৯ দিন, দুধ ০.৯ দিন এবং ফল মাত্র ০.৬ দিন খাওয়া হয়।

৯৬.৯ শতাংশ পরিবার অন্তত আংশিকভাবে লবণাক্ত ও আয়রনযুক্ত অগভীর নলকূপের পানির ওপর নির্ভরশীল। মাত্র ১৭.৬ শতাংশ পরিবার বলেছে, তাদের খাবার পানির উৎস সবসময় পাওয়া যায়। গত এক মাসে ৫০ শতাংশ পরিবারে অন্তত একজন পানিবাহিত রোগে ভুগেছেন, আর তাঁদের ৫২.৫ শতাংশ কোনো আনুষ্ঠানিক চিকিৎসা পাননি। নিরাপদ পানি ছাড়া খাদ্য ও পুষ্টির অধিকার পূরণ হয় না।

সরকারি জমিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে বসবাস করা পরিবারগুলোর ৫৯ শতাংশ উচ্ছেদ বা উচ্ছেদের হুমকির মুখে পড়েছে। গত ১২ মাসে ৭৭.১ শতাংশ পরিবারের ঘরে পানি উঠেছে। যে পরিবার যেকোনো দিন উচ্ছেদ হতে পারে, সে ঘর, স্যানিটেশন বা জীবিকায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে পারে না; আর ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বসতি তাদের পরের দুর্যোগের মুখেও ফেলে রাখে।

বাস্তুচ্যুতির সময় ৯২.৭ শতাংশ পরিবার গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি, ৬৩.৪ শতাংশ খাদ্য মজুত, ৪১.১ শতাংশ কৃষিজমি এবং ২৯.৯ শতাংশ মাছ ধরার সরঞ্জাম হারিয়েছে। কৃষক, জেলে ও পশুপালকেরা এখন মূলত দিনমজুরি, ভ্যান-রিকশা চালানো বা গৃহকর্মে যুক্ত। ৪৬.৩ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুতির আগের চেয়ে কম আয় করছেন, আর ৫২.৮ শতাংশ পরিবার বলেছে, বাস্তুচ্যুতির পর পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার জোগাড়ের সামর্থ্য কমেছে।

মাত্র ৭.৫ শতাংশ পরিবার কোনো সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আছে। গত ১২ মাসে ৭৯.১ শতাংশ পরিবার কোনো সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা পায়নি, আর সরকারি আবাসন কর্মসূচিতে আবেদন করতে পেরেছে মাত্র ৩.১ শতাংশ পরিবার। জাতীয় পরিচয়পত্র, স্থায়ী ঠিকানা ও ভোটার নিবন্ধনের জটিলতা এবং সঠিক তথ্যের অভাব প্রধান বাধা। সহায়তা না পেলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হয়, তা জানে না ৯২.৭ শতাংশ পরিবার। আবার যারা জাতীয় পরিচয়পত্র ইতোমধ্যেই পেয়েছেন, তারা উচ্ছেদের শিকার হলে নতুন করে বিপদে পড়বেন। অর্থাৎ বাদ পড়ার একটি বড় অংশ প্রশাসনিক, এবং বিদ্যমান কর্মসূচির মধ্যেই তা সমাধানযোগ্য।

অ-অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি, যে ক্ষতি হিসাবে আসে না

ঘরবাড়ি, ফসল বা গবাদিপশুর ক্ষতি টাকায় মাপা যায়। কিন্তু বাস্তুচ্যুতির গভীরতম ক্ষতিগুলোর অনেকটাই অর্থনৈতিক নয়: ঠিকানা ও পরিচয় হারানো, সামাজিক বন্ধন ও পারস্পরিক সহায়তার নেটওয়ার্ক ভেঙে যাওয়া, নতুন এলাকায় বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতা, শিশুদের পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ, এবং দীর্ঘ অনিশ্চয়তা থেকে তৈরি মানসিক চাপ।

সাতক্ষীরার অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে এর স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের ৩৩.২ শতাংশ স্কুলে নেই; ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের মধ্যে মাত্র ৩৫.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। স্কুলের বাইরে থাকা শিশু-কিশোরদের ৩০ শতাংশ শিশুশ্রমে যুক্ত। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রাক্কালে সাতক্ষীরায় আয়োজিত এক বহুপাক্ষিক সংলাপে এই অনানুষ্ঠানিক বস্তিতে বসবাসরত অংশগ্রহণকারীরা বলেন, পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ, পড়াশোনার সুযোগ কম থাকায় শিশু, কিশোর, পুরুষেরা জুয়া কিংবা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছেন, যেখান থেকে ফেরার পথ বা ফেরানোর পথ তাদের জানা নেই। আরেকজন অংশগ্রহণকারী বলেন "যেখানে থাকি, না সে জায়গাটা আমার, না যেখানে যাব সেই ঠিকানা আমি জানি, না যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যেতে পারব।"

জাতিসংঘের জলবায়ু কাঠামোতে বাস্তুচ্যুতি এখন ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি হিসেবে স্বীকৃত; ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি মোকাবিলা তহবিল এবং সান্তিয়াগো নেটওয়ার্কের আওতায় বাস্তুচ্যুতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তুচ্যুতি একদিকে ক্ষয়ক্ষতির ফল, অন্যদিকে নতুন অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক ক্ষতির উৎস। তবু দেশে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে এসব অ-অর্থনৈতিক ক্ষতি এখনো প্রায় অদৃশ্য, এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা- ন্যাপ ও জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানে- এনডিসিতে এগুলোকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা নীতিনির্ধারকেরাও বলে আসছেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাকে মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, আর অনুচ্ছেদ ১৮ পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১ এ বাস্তুচ্যুতির পরও সামাজিক ভাতা অব্যাহত রাখা, নতুন ঠিকানায় দলিলপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা, বসতির মানোন্নয়ন ও ভূমির মেয়াদি নিরাপত্তা, জীবিকা সহায়তা, এবং কাগজপত্রের অভাবে কোনো শিশুকে স্কুল থেকে বঞ্চিত না করার অঙ্গীকার রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২২–২০৪২, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০২৩–২০৫০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত স্থানীয় নেতৃত্বাধীন অভিযোজন বিষয়ক জাতীয় কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা।

কিন্তু অঙ্গীকার আর বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান এখনো অনেক। ভাতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারের বিপরীতে মাত্র ৭.৫ শতাংশ পরিবার সামাজিক সুরক্ষায় আছে; ভূমির নিরাপত্তার অঙ্গীকারের বিপরীতে সরকারি জমিতে থাকা পরিবারের ৫৯ শতাংশ উচ্ছেদের হুমকিতে; আর শিক্ষার অঙ্গীকারের বিপরীতে এক-তৃতীয়াংশ শিশু স্কুলের বাইরে।

দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন উদ্ধার তৎপরতা ও পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্ষমতাকে 'রোল মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলছে, টেকসই সমাধান কেবল জলবায়ু দুর্গত মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ করা বা কোথায় থাকবেন, সেই প্রশ্ন নয়। এর অর্থ দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতির কারণে হারানো জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেওয়া এবং অধিকার পুনরুদ্ধার করা: দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা; আবাসন, পানি, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ পর্যাপ্ত জীবনমান; জীবিকা; হারানো সম্পদের ক্ষতিপূরণ; এবং দলিলপত্র ও কার্যকর প্রতিকারের সুযোগ। এই মানদণ্ডে সাতক্ষীরার পরিবারগুলো এখনো টেকসই সমাধান থেকে অনেক দূরে।

আগামী ৯ থেকে ২০ নভেম্বর তুরস্কের আনাতোলিয়ায় জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১ অনুষ্ঠিত হবে, যার মূলমন্ত্র "সংলাপ থেকে ঐকমত্য, ঐকমত্য থেকে কর্ম"। গত বছর বেলেমে কপ৩০ ২০৩৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ করা, খাদ্য ব্যবস্থা ও পানি নিরাপত্তাসহ বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যের অগ্রগতি মাপার সূচক নির্ধারণ, এবং মানবাধিকার ও প্রান্তিক মানুষের অন্তর্ভুক্তিসহ ন্যায্য রূপান্তরের একটি নতুন ব্যবস্থা গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি মোকাবিলা তহবিলও দেশের নিজস্ব জাতীয় কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্তাবে অর্থায়ন শুরু করেছে।

২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের পরামর্শমূলক মতামত জানিয়েছে, যেসব উচ্চ নির্গমনকারী দেশ ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ হতে পারে। ফলে বাস্তুচ্যুতিসহ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অর্থায়ন আর কেবল সদিচ্ছার বিষয় থাকছে না। তবে তহবিলটি তখনই কার্যকর হবে, যখন এর নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পুনঃপূরণ নিশ্চিত হবে এবং সবুজ জলবায়ু তহবিল ও অভিযোজন তহবিলেও বাস্তুচ্যুতি সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই প্রতিশ্রুতিগুলো সফল হলো কিনা, তার একটি বাস্তব মাপকাঠি হলো দুর্যোগে ঘর হারানো মানুষের কাছে পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার পৌঁছাচ্ছে কিনা।

আমাদের সুপারিশ

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে:

1. জলবায়ু বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ভূমির নিশ্চয়তায় সরকারি খাস জমিতে স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
2. বাস্তুচ্যুত নারী-পুরুষ ও তরুণদের জন্য শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ, আর্থিক সেবা এবং স্থানীয় শ্রমবাজারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
3. বসতির পরিবারগুলোকে জরুরি খাদ্য সহায়তা, ন্যায্যমূল্যের খাদ্য কর্মসূচি এবং প্রযোজ্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের জন্য পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
4. প্রতিটি বসতিতে নিরাপদ খাবার পানির উৎস স্থাপন, নিয়মিত পানির মান পরীক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
5. পৌরসভা ও জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন, নগর ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু অভিযোজন, আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনায় বাস্তুচ্যুত মানুষকে স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জলবায়ু বাস্তুচ্যুত মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
6. পুনর্বাসন ছাড়া কোনো উচ্ছেদ করা যাবে না। বসতিগুলোর মানোন্নয়ন, বসবাসের আইনি নিরাপত্তা এবং খাসজমিতে গুচ্ছ আবাসন বা স্বল্প ভাড়ার আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
7. ঠিকানা বদলের কারণে কেউ যেন সামাজিক সুরক্ষা থেকে বাদ না পড়েন, সেজন্য বসতিভিত্তিক তালিকাভুক্তি ক্যাম্প করতে হবে এবং সহায়তা না পেলে অভিযোগ জানানোর সহজ ও কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
8. বর্তমান ঠিকানায় জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার নিবন্ধন এবং হারানো কাগজপত্র পুনরুদ্ধারে ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পের আয়োজন করতে হবে।
9. কাগজপত্র না থাকায় কোনো শিশুকে স্কুলে ভর্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ঝরে পড়া ও শিশুশ্রম রোধে বিশেষ উদ্যোগ এবং বসতিগুলোতে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে।
10. জলবায়ু বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর সংখ্যা, বাস্তুচ্যুতির কারণ, বসবাসের অবস্থা, মৌলিক সেবায় প্রবেশাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক ও নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণদের পরিস্থিতি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

কপ৩১-এ বাংলাদেশের অবস্থানে:

1. ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি মোকাবিলা তহবিলে বাংলাদেশের প্রস্তাবে জাতীয় কৌশলপত্র ২০২১ বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে হারানো জমি, জীবিকা, পরিচয় ও সামাজিক বন্ধনের মতো অ-অর্থনৈতিক ক্ষতিও বিবেচনায় আসে।
2. বৈশ্বিক অভিযোজন লক্ষ্যের অগ্রগতি প্রতিবেদনে বাস্তুচ্যুত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য আলাদাভাবে তুলে ধরা।
3. অভিযোজন অর্থায়ন ও স্থানীয় নেতৃত্বাধীন অভিযোজনে শহরের অনানুষ্ঠানিক বসতিতে থাকা জলবায়ু-বাস্তুচ্যুত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা।
4. পর্যাপ্ত, পূর্বানুমানযোগ্য, বহুবছরমেয়াদি ও অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের নিয়মিত পুনঃপূরণের দাবি তোলা, যাতে অর্থ জরুরি ত্রাণে সীমাবদ্ধ না থেকে টেকসই সমাধানে ব্যয় হয় এবং দেশের ঋণের বোঝা না বাড়ে।

দুর্যোগ শেষ হলেও বাস্তুচ্যুতি শেষ হয় না; বরং সেখান থেকেই শুরু হয় খাদ্য, পানি, আবাস, জীবিকা ও মর্যাদার এক দীর্ঘ সংকট। নীতি ও প্রতিশ্রুতির অভাব আমাদের নেই। প্রয়োজন সেগুলোকে বাস্তুচ্যুত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৌঁছে দেওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের অবদান সবচেয়ে কম, তাদের যেন প্রথমে ঘর ও জীবিকা হারিয়ে, তারপর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থার ব্যর্থতায় দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।